অতিথি সৎকার

হাসান আজিজুল হক

আগাগোড়া ভর্তি আমাদের জিপটা পাটকেলঘাটা ব্রিজের মুখে গিয়ে আটকে গেল। আর যাবে না। ব্রিজটা যে ভাঙা তা নয়, বরং নতুনই। সাতক্ষীরা শহর থেকে তিন-চার মাইল দূরে কংক্রিটের তৈরি এই ব্রিজ খুব মজবুত, বসন্তকালের দুপুরের শুকনো মিষ্টি বাতাস যেন আহ্লাদে দুলছে। ধান কেটে নেবার পরে দু'পাশের মাঠ সোনালি, নাড়াগুলি এখনও কালো হয়ে যেতে শুরু হয়নি। পাকা শীষ থেকে ঝরে-পড়া ধান-ও কিছু নিশ্চয় জমিতে পড়ে আছে, নাহলে কাক, শালিক, চড়ুই এত ভিড় করবে কেন। দেখেশুনে আমাদেরও মন-মেজাজ ফুরফুরে হয়ে উঠল, যাব যখন স্থির করেছি যাবই। ব্রিজটা না থাকলেই বা কী হত, ভাঙাচোরা জিপটাকেই নামিয়ে দিতাম আধ-শুকনো নদীতে। আসলে থামতে হয়েছিল অন্য কারণে। এই ঝকঝকে পাকা রাস্তাটা ছাড়া দু'পাশের জনপদ গত একশ' বছরের মতোই স্থির হয়ে আছে, দূরের সুন্দরবনের ভীষণ ছায়া আর নির্জনতা এতটা উজিয়ে এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে। নতুন তৈরি এই ব্রিজটাই আধুনিকতার শেষ উপদ্রব। এটা পেরিয়ে যাওয়ার পরেই তো সত্যিকার যাবার জায়গায় এগোতে পারব। থামতে হয়েছিল এইজন্য যে, ব্রিজটার পরেই যে কাঁচামাটির রাস্তা শুরু হয়েছিল, দুপাশের মাঠের সঙ্গে মেশা এই রাস্তা, খাল-বিল পাত্তা না দিয়ে সবই বুকে নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। শূন্য ধানের জমির নাড়াগুলির গোড়ায় যেসব ঝিনুক-তোলা চিকচিকে পরিষ্কার পানি জমেছে, রাস্তার ওপরেও তেমনি গরুর খুরের গর্তগুলিতে পানি জমেছে। ওই রাস্তায় নেমে যাবার জন্য আমাদের তর সইছে না জিপের ইঞ্জিনটাও দেখি উত্তেজনায় টানা গর্জন করে যাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ব্রিজের পরেই রাস্তার অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে তৈরি করেছে বিরাট এক খাদ আর বাঁ-দিকে যেটুকু রাস্তা পড়ে আছে তা এতই সরু, কাদায় পিছল আর অনিচ্ছুক যে ব্রিজ পার করে এখানে গাড়ি তুলতে কারুর ভরসা হচ্ছে না। শুধু ড্রাইভার ছোঁড়াটা দেখি মুচকি মুচকি হাসছে। গাড়িটা খাদে ফেলে দিতে পারলেই যেন তার দায়মুক্তি। এদিকে গাড়ির মালিক আমাদের বন্ধু সিগারেট টানছে আর বলছে, হারামজাদা জিপের বাচ্চা যদি খাদে পড়ে, ওকে তুলবই না। ওটার জন্যই নতুন একটা জিপ কিনতে পারছি না।

আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে একপাশ করে দাঁড়াই। গড় গড় করে ব্রিজটা পার হয়ে ঢালুর মুখে কষে ব্রেক টেনে ওকে থামানো হয়েছে, বিশ-বাইশ বছরের পেট-রোগা শীর্ণ ড্রাইভার ছেলেটি স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে আছে, ইঞ্জিন কিন্তু থামায়নি। অকুতোভয় ছেলে রাগে আর জেদে তার পুরো শরীরটাই যেন একটি বিদ্যুৎ-শলাকা।

যাবানি তালে? গাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করল সে, ডাইনে কাৎ হয়ি কাদায় পড়তি পারে কিন্তু। আমি তহন লাফ দিয়ে বাঁ-দরজা দিয়ি নেমে যাবানি কলাম।

তা যেও। গাড়ি যদি গাড়ায় পড়ে, তোমারেও কিন্তু পুঁতে রেখে যাব মনে রেখ। নতুন গাড়ি নতুন ড্রাইভার এক সাথে কিনব। গাড়ির মালিক দারুণ মজায় বার দুয়েক আমাদের সবার দিকে চেয়ে চোখ মটকায়।

ধাঁ করে গাড়ি বেরিয়ে যায়। ক্লাচ ব্রেক একসেলারেটর গিয়ার চেপে কী যে ছেলেটা করল কে জানে, গাড়িটা যেন চিতাবাঘের মতো একটা লাফ দিল, রাস্তার কিছু ভিজে কাদামাটি ভেঙে পড়ল। খাদে পড়ার জন্য যেন মুখিয়েই ছিল নেহাৎ সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই ড্রাইভার তাকে কাদাভরা সমান রাস্তায় এনে ফেলেছে।

আলাদা রাস্তা বলে কিছু নেই। দু'দিকের মাঠের সঙ্গে একেবারে সমতল, কোনও কথা না শুনে লোকজন জোর করে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করেছে বলেই রাস্তা। গরু-ছাগলও যাতায়াত করেছে, তাদের খুরের চিহ্ন, গরুর গাড়ির চাকার গভীর দাগ, দুচারটি মোটরগাড়ি চলাচলের দাগও যে একেবারে নেই, তা নয়। তবে রাস্তা কিছুতেই সিধে যাচ্ছে না, খুব ঘুরপাক খাচ্ছে। বড় বড় বাঁকের আধা-বৃত্ত পরিত্যক্ত পড়ে থাকছে। কোনও একটা গ্রাম স্পর্শ করছে রাস্তা, দুএকটি তেঁতুল, আম, নিম গাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কোনও গ্রামে ঢুকছে না।

একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের যে বড় নেতার আত্মীয়ের বাড়ি আমাদের যাওয়ার কথা, তাঁর গ্রামটি পাটকেলঘাটা ব্রিজ থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আছে বলে জানি। ইতিমধ্যে এমন কিছু হয়নি যে গ্রামটি সরে যাবে। তাহলে দেখা মিলছে না কেন। নেতা বন্ধু ঝাঁপালো কাঁচা-পাকা গোঁফের নিচে মিটি মিটি হাসতে থাকেন। তার কথা হচ্ছে, অনেক দিন তিনি এদিকে আসেননি, ঠিক চিনতে পারছেন না, রাস্তা ছাড়া যাবে না। এ রাস্তা গ্রামে ঢুকবেই। এটা তার জানা আছে। তবে ভদ্রলোককে খবর দেওয়া নেই, এতগুলো লোক আমরা যাচ্ছি দুপুরবেলার রাক্ষুসে ক্ষিধে নিয়ে। একটু আগে পৌঁছনো ভালো। তা নাহলে তিনি খুবই অপ্রস্তুত বোধ করবেন।

এইসব আলোচনা হচ্ছিল। খানিকক্ষণ আমরা বোধহয় আলাপে মশগুল ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করি, রাস্তাটি একটি গাঁয়ের ভূমিকা-অংশে ঢুকে পড়েছে। দুপাশে বড় বড় গাছ, খানিকটা দূরে উঁচু পাড়ওয়ালা একটি দিঘির আভাস, ইতস্তত ছড়ানো মানুষের প্রতিদিনের ঘষটানি-লাগা জমি, আর যে কোনও গ্রামে ঢোকার সেই অবধারিত আঁশটে গন্ধ, শুকিয়ে-ওঠা মনুষ্য-বিষ্ঠার সঙ্গে যা মিশে থাকে।

ভূমিকা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়, আমাদের জিপ সোজা ঢুকে পড়ে বড় পড়ো একটি উঠনে। সেখানে এমন একটা বুড়ো আম গাছ যা আর একটাও ফল দেয় না, একটু দূরে এমন একটি গাইগরু চরছে কবেই যার বাচ্চা দেওয়া বন্ধ হয়েছে, হাতের ডাইনেই এমন একটা ঘর যেখানে কেউ থাকে না। দুতিন বিঘে জায়গা জুড়ে এই খামার, পুরু ঘাসে ছাওয়া, একদিকে একটু ঢালু, আর একদিকে একটু উঁচু পড়ো ভিটে, ঘরের কোনও চিহ্ন নেই, পাশেই আছে বেগুন খেত, শীতে বেগুন যা ফলাবার ফলিয়ে এখন রোদে শুকোচ্ছে। বোঝা যায়, অনেকটা জায়গা জুড়ে এই বসতবাড়ি। এদিকে যেমন হয় দশ-বারো বিঘে জায়গাজুড়ে। পশ্চিম দিকে একটার পর একটা এলোমেলো বাস করার ঘরগুলো, বাইরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে। সেদিকে ভীষণ অন্দর, ভিতরে উঠুন। এই বাড়িটার বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনও দিকে আড়াল করার চেষ্টা নেই, সবটাই খোলা।

মনে হয় গাড়ির শব্দ পেয়েই চেক লুঙি আর ফর্শা গেঞ্জি গায়ে গৃহকর্তা বেরিয়ে এলেন। ছিপছিপে চেহারা, চোখ দু'টি শান্ত না নিস্পৃহ ঠিক বুঝতে পারি না। আমাদের বন্ধু বাম নেতা তার শ্যালক। অতি মধুর সম্পর্ক কিন্তু ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বেলায়ও উচ্ছ্বাস কিংবা হৃদয়চাঞ্চল্য প্রকাশ করা বাম রাজনৈতিক ঐতিহ্যে একরকম নিষিদ্ধ। কিন্তু গৃহকর্তার তো সে বালাই নেই, তবু তিনি কেমন একটা জন্ডিস-জর্জর হলুদ চোখে চেয়ে মৃদু গলায় শুধু বললেন, বাড়িতে সব ভালো? আম্মা ভালো আছেন?

অতি প্রখর বাস্তববাদী, ভাবপ্রবণতামুক্ত সিদ্ধপুরুষ আমাদের বন্ধু উত্তর দেয়া দরকার মনে করলেন না। তিনি শুধু বললেন, অসময়ে খবর না দিয়ি আইছি, দুফরে খাওয়া হোয়নি।

আচ্ছা, আমি আসতিছি- এইটুকু মাত্র বলে গৃহস্বামী বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। একবার আকাশ দেখি। কি-ই বা দেখার আছে? খুব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গাঁ দেখার চেষ্টা করি, তেমন কিছু দেখা যায় না। ডোবা, পুকুর, পড়ো ভিটে, বড় গাছ, ছোট গাছ, বাঁশঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল এসব। নিজের ওপর খুব রাগ হতে থাকে। এত গাঁ চেনার কি দরকার! স্বপ্ন তো বার বার ভাঙে। নির্জন ডানপ্রান্তে বিশাল বট এখনো তো দেখিনি। পাহাড়ের মতো উঁচু পাড়-অলা দিঘি, অর্জুন হরিতকি নিম অশ্বত্থে ভরা, গভীর পদ্মবন, ভাঙা দেউল, পুরনো মসজিদ আর নিমগ্ন জীবনযাপন। কিছুই নেই, সব ছত্রখান।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, গাড়ির ভেতর থেকে কালো গাট্টাগোট্টা একটি ছোকরা বেরিয়ে আসছে। তার বগলে একটা পুরনো মাদুর, হাতে পানি-ভরা বিরাট এক পেতলের জগ। কারো দিকে না চেয়ে, আমাদের পাশ কাটিয়ে সে ডানদিকের ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো। খিদেতে ততক্ষণে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। ঢুকেছি প্রত্যেকের নিজের নিজের ভেতরের জন্তুর গর্তে। খাবারের গন্ধ পেয়েই আমরা ছেলেটার পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকি। ধুলো না ঝেড়ে সে শক্ত-মজবুত কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশের ওপর মাদুরটা পেতে ফেলে। এককোণে রাখে পানি-ভরা জগ। তারপর বেরিয়ে যায়। আমরা কেউ-ই গর্ত থেকে বেরুতে পারি না, সোজাসুজি তাকাতেও পারি না একে অন্যের দিকে। শুকনো জিভের ওপর দিয়ে দু'একটি কথা শুধু খড় খড় করে ওঠে। ঘরের ভেতরটায় গরম আর ধুলো। এক কোণে একটা চড়ুই পাখির মুণ্ড।

ছেলেটা আবার এসে ঘরে ঢুকল। এবার তার দুহাতে দুটি গামলা। একটিতে অসম্ভব নিরুৎসাহজনক পাতলা ঠা া ডাল, তাতে সামান্য ঢেউ আর একটিতে ডেলা-পাকানো ভাত। খুব ভালো কথা হচ্ছে দুটোই পুরোপুরি ভরা। ছেলেটির পেছনে পেছনে এবার এলেন গৃহস্বামী। তার এক হাতে বড় এক বাটি পুঁইশাক, অন্য হাতে একগাদা চিনা মাটির বাসন। তিনি এসে দাঁড়াতে আর চোখের ইঙ্গিতও দরকার হয় না। আমরা চমৎকার শৃপখলায় তক্তপোশের ওপর বসে যাই। করকরে ঠাণ্ডা ভাত পুঁইশাক দিয়ে মেখে দু'এক গ্রাস মুখে তুলে আমাদের নেতা বন্ধুটির মুখের দিকে চেয়ে দেখি। অস্বস্তি আর লজ্জায় তার বামপন্থী মুখ সামান্য আরক্ত- গোঁফজাড়া ওঠানামা করছে। ভগ্নিপতি এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন, একটি কথাও বললেন না। ঝটপট দ্রুততায় শেষ তণ্ডুলকণাটি, পুঁইশাকের সর্বশেষ পাতাটি আর ডালের তলানিটুকু পর্যন্ত অদৃশ্য হল আর নিজের গর্ত পুরোপুরি বুজিয়ে ফেলায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের সকলের মুখের চামড়ায় স্বাভাবিক রং ফিরে এল। আলো রোদ হাওয়া ভালো লাগতে লাগল, জীপের মালিক আমাদের ভীষণ বড়লোক বন্ধু আবার খুনসুঁটি চালাতে শুরু করলেন। বাংলাদেশের মানুষের নিদারুণ দুরবস্থা আর আসন্ন বিপস্লব নিয়ে দুচারটে কথা শুরু করাও এখন সম্ভব বলে মনে হল। এর মধ্যে কয়েক বার আমি আমাদের ধনী বন্ধুটিকে দেখেছি। কোনও খাবারেই কখনোই তার তেমন আগ্রহ দেখিনি। মুখে খাবার নিয়ে এমন এলিয়ে চিবোনোর অভ্যেস তার যেন ভেতরে ঢুকতেই চাইছে না মুখ-ভরা খাদ্য উগড়ে পড়ল বলে। হুইস্কি-টুইস্কি হলে একটু-আধটু লোভ করতে দেখেছি তাকে কখনও কখনও। অত যে কথা বলেন, ভুলে তার একটি শব্দ ছিল না এতক্ষণ। তক্তপোশে বসার আগে যখন ভাত-ডাল সাজানো হচ্ছিল, বিবর্ণমুখে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সবার পিছনে। আর খাওয়ার সময় একবার দেখেছিলাম তাকে। কী গভীর মনোযোগ তার, যেন সাধনায় বসেছেন। একটি শাকপাতা তার বাসন থেকে সরাবার চেষ্টা করলে একেবারে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

ইস, সব সময় দেখেছি, পেট ভরে গেলে আর মনেই থাকে না কি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পেট ভরানো হল। পছন্দ-অপছন্দ সব খাবার আগে খাওয়া হয়ে গেলেই তৃপ্তি অবিকল এক। এখন আমাদের এত ভালো লাগতে থাকে যে, পেটের খাবার ফুঁড়ে একটি-দুটি সমালোচনা বুড়বুড়ি কেটে উঠতে থাকে। ডাল-ভাত বলে বটে, তার মানে এই? তাহলে ঐ গোবরের মতো পুঁইশাকটি আনার দরকার কী ছিল। গেরস্থবাড়ি তো বটে, কিছুই আর জুটল না? আমাদের খর জিভ নিশপিশ করতে থাকে, নেতা বন্ধুটির জন্য কোনও কথা বলতে পারি না। মনে হল তিনিও একটু অবাক ও আহত হয়েছেন ভগ্নিপতিটির কা দেখে।

ব্রিজের আগে সেই ভাঙা রাস্তাটির কথা মনে ছিল। সন্ধ্যের আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু তার তো এখনও অনেক দেরি। মাদুরের তলায় শুকনো ধুলো, তার একটা কেমন গন্ধ, মুলিবাঁশ থেঁতলে ঘরের বেড়া, বৃষ্টিতে ভিজে রোদে শুকিয়ে তারও কেমন একটা অ□ভুত গন্ধ, চড়ুইয়ের মাথাটা কেউ সরায়নি, এখন দুএকটি পালক উড়ছে। কিছুতেই তক্তপোশে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। বন্ধুরা সব সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে ফেলেছে। একটু বাইরে থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়! গ্রামটাকে ভালো করে দেখা হয়নি। ওপাশে নাকি একটা বিরাট বিল আছে, বিশ্বাসঘাতক বিল, ঘন ঘাস-জঙ্গলে ভরা, একবার তার আওতার মধ্যে কাউকে পেলে আর ছাড়ে না, লতাপাতা জড়িয়ে ফাঁসি দেবেই। দেখে এলে কেমন হয়। সরিতেন্দুর দোনলা বন্দুকটা তো আছে, ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাই বরং। বন্দুকটা আবার পাগলা। সরিতেন্দুর বাবার বন্দুক, নামকরা বেলজিয়ান 'গান'। পুরনো হয়ে বুড়ো হয়ে ওটা এখন আরও খ্যাপাটে হয়ে গেছে। অনেক দিন আগে একবার নৌকা নিয়ে অন্য একটা নিরীহ বিলে সরিতেন্দু একটি ভুতুড়ে পানকৌড়িতে গুলি করেছিল। আমি যা ভেবেছিলাম। দুম করে গুলি বেরিয়ে যাওয়ার পর ধোঁয়া। আমি প্রথমটায় কিছু দেখতে পাইনি। ধোঁয়াটা কেটে যেতে দেখি মুমূর্ষু পানকৌড়ি ডানা ঝাপটাচ্ছে একদিকে। সরিতেন্দু নৌকো থেকে ছিটকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে বিলের পানিতে। বন্দুকের কুঁদোটা চলে গেছে পানির তলায় আর শুধু নলটা একা পড়ে আছে নৌকোর ওপর। এদের সবাইকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় করতে অনেকটা সময় লেগেছিল।

তবু বন্দুকসহ সরিতেন্দুকে নিয়েই বের হই। এমন ঘন বসতির গ্রামের আশপাশে কি এত ভয়ঙ্কর একটা বিল থাকতে পারে? উঁচু মজবুত মাটির পথ ধরে হাঁটতে থাকি। গাঁয়ের বয়স জানার উপায় হচ্ছে কী কী

গাছ আছে আর সেইসব গাছের বয়স কি রকম জানতে শেখা। আর ফেলে যাওয়া ভিটেগুলো খুঁজে দেখা। এমনিই একটি নির্জন ভিটে পুব-উত্তর কোণে বিশাল শিমুল গাছে একজোড়া ঘুঘু দেখে সরিতেন্দুর জিঘাংসা জেগে উঠল। শীত শেষ হওয়ার আগেই এই গাছ কেমন করে এক-গাছ শিমুল ফোটাল সে কথা সরিতেন্দুকে বলতে যেতেই দেখি, সে উপরে-নিচে বসে থাকা ঘুঘু দুটির দিকে বন্দুক তুলেছে। এই শিমুল অন্তত দেড়শ' বছরের পুরনো। তাই নাকি বলে সরিতেন্দু বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে জানাল, ইস, এক নম্বর টোটা! এ দিয়ে তো ঘুঘু মারা যাবে না। আট নম্বর টোটাগুলো ঘরে ঝোলার মধ্যে রেখে এসেছি দেখছি। তাহলে আর মারার দরকার কী! এখানে তো কেউ নেবে না। ফেলে দিতে হবে। তাছাড়া তোমার ওই এক নম্বর গুলিতে ছাতু হয়ে যাবে পাখি দুটো। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সরিতেন্দুর বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে গেল। বহু কষ্টে সরিতেন্দু পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালো। একদিকে ঠিকরে পড়ল কুঁদোটা, আর একদিকে নলটা। কিন্তু পাখি দুটো গেল কোথায়? ওরা কি উড়ে গেছে? হতেই পারে না সরিতেন্দু বলল, দুটোই পড়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ভিটের ঢালুতে ভাঁট জঙ্গলের মধ্যে তাদের কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাওয়া গেল। একটার বন্ধ রাখা অটুট ঠোঁট, অন্যটার শরীরের নিচের অংশ, সেটা হাতে নিতে দপদপ করছে হৃৎপিণ্ড। সেখানকার মাংস তপ্ত। সরিতেন্দু খুব সুদর্শন। এখন এমন কুৎসিত লাগল ছেলেটাকে!

বিলে পৌঁছতে অনেকটা সময় যায়। গাঁ শেষ হয়ে গেলেও সে চোখে পড়তে চায় না। উঁচু-নিচু বড় জমি, বড় বড় অফলা আম-জাম গাছ অনেকটা জায়গা পেরিয়ে বিল শুরু। এতটা সম্পূর্ণ, এতটা ভরা, এতটা একা আমি ভাবতেই পারিনি। শুরুর দিকটাতে গলা পর্যন্ত উঁচু জঙ্গল, কটা রঙের এই লম্বা লম্বা ঘাসের নাম জানি না। রাগী জটিল বুনো জঙ্গল হয়ে আছে। প্রায় সিকি মাইল এরকম, তারপর জলা শুরু। হঠাৎ নামাটা আমাদের উচিত হয়নি। প্রকৃতির অনেক জিনিস আছে, যারা মানুষ পছন্দ করে না। এতই বিরূপ থাকে যে নাগালের মধ্যে পেলেই মেরে ফেলে। অনেকটা ভেতরে নেমে যেতে মনে হল হাঁটুর উপরে কালা মোটা পানি উঠে গেল। আরও কি আছে অনেক দূরের নিবিড় জলরাশির ওপারে, এসব দেখার জন্য যখন উঁকি দিয়েছি ঠিক তখনই সরিতেন্দুর পা লতাজালে জড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভাবনাটা এলো, আমরা কি আবার ফিরতে পারব। মানুষজনসুদ্ধ সমস্ত গাঁটিকে এত অলীক লাগছে, আর সবচেয়ে স্বাভাবিক লাগছে এই একা, স্বয়ংনির্ভর বিলটাকে। তখন বাতাস কেটে ভয়ংকর শব্দে উড়ল হাজার খানেক বালিহাঁসের একটা ঝাঁক। সরিতেন্দুর বন্দুকের নল তখন পানির মধ্যে মুখ ডুবিয়েছে।

ঘণ্টা খানেক পরে যখন আবার গাঁয়ের রাস্তায় উঠে এসেছি, সরিতেন্দু আমি দুজনেই তখন বদলেছি খুব। দুজনের প্যান্ট ফালাফালা ছেঁড়া, গায়ে-মাথায় বিচ্ছিরি গন্ধ-অলা কাদা আর ঘাস। শার্টের বোতামগুলো কোথায় গেছে জানা যায় না।

কতটুকু মানুষ আমরা যখন গৃহস্বামীর বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছি! সূর্যের শেষ আলোটুকু তখনও ঝিকমিক করছে। চারপাশ গাছে ঘেরা। মাঝারি আকারের একটা পুকুরে নেমেছে অনেক মানুষ। পুরো গাঁয়ের মানুষই কি? খালি গায়ে বা গামছা গায়ে বুড়োরা নিরীহ শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কলরবে কান ফাটাচ্ছে শিশু-কিশোরের দল। পটু, দক্ষ মানুষগুলো পুকুরে নেমেছে জাল নিয়ে, পলুই নিয়ে। ডাঙায় লাফাচ্ছে বড় বড় কিছু রুই-কাতলা। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যেয় ছাই ছাই অন্ধকার নেমে আসছে। একবার যেন দেখলাম সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে গৃহস্বামী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই চেক লুঙ্গি আর গায়ে গেঞ্জি।

বাড়ির বাইরের বড় উঠোনটায় ফিরে এসে দেখি, বন্ধুরা নরক গুলজার করে তুলেছে। এতটা দেরিতে ফিরে সবার জন্য কি ভীষণ অসুবিধে তৈরি করে ফেলেছি ভেবে লজ্জা হচ্ছিল। রওনা হওয়ার সময় তো পেরিয়ে গেল! রাত বেশি হওয়ার আগেই সাতক্ষীরা পৌঁছাবার কথা আমাদের। দুপুরের খাওয়াটার কথা মনে পড়ছিল। রাতে যদি ফেরা না হয়, আর দুপুরের ওই খাবার আর একবার যদি গলাধঃকরণ করতে হয়, তাহলে নিজের জন্য নিজের শোকে কেঁদেও পার পাওয়া যাবে না। ছেঁড়াখোঁড়া জামা-প্যান্ট, পায়ে-মাথায় কাদা লুকিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছি। আমাদের আমুদে ধনী বন্ধুটি আমাকে জাপটে ধরলেন, আজ আর আমাদের ফেরা হচ্ছে না। রাতে এখানেই থাকতে হবে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেও বোধহয় সেটা একটা মর্মান্তিক বোধ হত না। এরা কি পাগল, এই বাড়িতে রাত কাটাতে চায়? একবার নেতা বন্ধুটির দিকে

চেয়ে দেখি, মনে হল গোপন মজায় তিনি ফিকফিক করে হাসছেন। আমি আমুদে বন্ধুটিকে বললাম, আপনারা থেকে যেতে পারেন, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব, সম্ভব, খুব সম্ভব গাড়ি তো আর যাচ্ছে না। অন্ধকার রাত, চার মাইল রাস্ত্মা আর রাস্ত্মা আছে কি নেই তা হাঁটতে হাঁটতেই ঠিক করে নিতে হবে।
বাড়ির ভেতর থেকে কালো ছোকরাটি বেরিয়ে আসছে। তার দু'হাতে দুটি হ্যাজাক। কেবল জ্বালানো হয়েছে। এখনও হিসহিস করছে। শুধু সে দুটির তীব্র আলোকে সম্মান দেওয়ার জন্যই সন্ধের অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে ঘন হয়ে এল।
এখন উঠোনের পুরো মাঠটা আলোয় ভাসছে। গাড়ির ভেতরেও বোধহয় দু'তিনটি হ্যাজাক-লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। পুকুরের দিকটাতে, বাড়ির উত্তরের গা ঘেঁষে অস্থায়ী একটা চালা তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। যার খুঁটিতে বাঁধা দুটি মাঝারি আকারের খাসি। সেখানে অনেক লোক হারিকেন জ্বালিয়ে কাজ করছে। বোঝা গেল ওটা একটা অস্থায়ী রান্নাঘর। উঠোনের প্রান্ত্মে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের ভেতরের দিকে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করি। আলো নেই বললেই চলে। যেমন হয়, দু'একটি হারিকেন, প্রদীপ বা লম্ফ জ্বলছে মিট মিট করে। কিন্তু সন্ধ্যের এই অন্ধকার যেন সামান্য মিষ্টি তপ্ত, আকাশ থেকে তারাগুলো খানিকটা নেমে এসে অন্ধকারের সাহায্যে মৃদু মৃদু হাসছে। পুকুরের দিক থেকে অনেক মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দুপুরের মরা গ্রামটি, সন্ধ্যেয় শক্ত হয়ে যাওয়া বিলের হিম-নীরবতার কঠিন চাপে আটকানো জনপদের শবদেহ প্রাণ ফিরে পেয়ে যেন উঠে বসেছে। এই জাদু কখন কীভাবে ঘটল জানি না। পুকুরের দিক থেকে সুস্পষ্ট শোরগোলের মধ্যে বালক কণ্ঠের চিৎকার, মিয়া বাড়িতি অতিথ আইছে; সামান্য একটুক্ষণের স্ত্মব্ধতা, হ্যাজাকের শো শো শব্দ, দুটো ছাগলের একটার ভাঙা গলার আওয়াজ, আবার স্ত্মব্ধতা ফুঁড়ে, সোবাই কি মাছ পালো মেয়া ভাই বলে দিইছে, মাছ যেন সোবাই পায়, বাড়িতি নামি অতিথি খাবে। তাদের সম্মানে গাঁয়ের সোবাইকে মাছ দিতি হবে, সোবাই কি পাইছে? অলো কথা কস্ না ক্যানো, একটু চুপ। আবার মেয়া বাড়ির অতিথি, মেয়া বাড়ির অতিথি, ডাবুরি বুড়ি কনে, অ্যাই ছ্যামরা, তোর সাঙর ভেঙে দেবানে কলাম। এদিকে একটু ফিকে আঁধার। ঘাসে ঢাকা পায়েচলা পথ। চোরের মতো বাড়ির দিকে আসছেন গৃহস্বামী। কখন পোশাক বদলে এসেছেন, মোটা শাদা কাপড়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরনে। ওখান থেকে সরে আসি। আমাকে দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইবেন, আমারও সাধ্য নেই তার চোখের দিকে তাকাবার। যুক্তি অতিক্রম করেছে, ভাবপ্রবণতাও আর হালে পানি পাচ্ছে না। সমর্থন-অসমর্থন সমান নিরর্থক। কোন উৎস থেকে জানি না, সমস্ত্ম হৃদয়ভার ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে অচ্ছেদ্য নৈর্ব্যক্তিক যোগাযোগ আমাকে প্রায় কাহিল করে ফেলে। একটা এলোমেলো অপ্রস্তুত আবরণী খসে পড়া কাছাখোলা অবস্থায় এ মানুষটির মুখোমুখি হওয়া চলবে না।
জামা-কাপড় তখনও বদলানো হয়নি। দুপুরে যে ঘরটায় তক্তপোশে বসে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, বন্ধুরা সেখানে বসে তাস খেলছে। এখানেও একটি হ্যাজাক। মুখ গোমরা, ধুলোভরা গুমোট ঘরটা এখন হাসছে। দুমদাম শব্দে তাস পেটানো হচ্ছে। নেতা বন্ধু তাস খেলেন না, মুখে সেই সবজান্ত্মার মৃদু হাসি। তিনি কি সব জানতেন? তার অস্বস্তি্মটুকু কি অভিনয় ছিল? তিনি কি আমাদের নির্বুদ্ধিতা উপভোগ করছিলেন?
প্যান্ট-শার্টটা আমি বদলে ফেলি। এককোণে সরিতেন্দুর বন্দুক এখন অটুট বটে। কিন্তু লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে আছে। বন্দুক বংশের কুলাঙ্গার! হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন আমাদের আমুদে বন্ধু ঃ এই জীবনের শ্রেষ্ঠ ভোজন আজ রাত দুটোয়। এর জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়ার সময় দেওয়া হয়নি। এ জন্য আমরা প্রতিবাদ জানাই। এরকম ভোজনের জন্য তৈরি হতে ছ' মাস সময় লাগে, তিন-চারটে ডাক্তার লাগে অথচ আমাদের ছ' ঘণ্টা সময়ও দেয়া হয়নি। আমরা এর প্রতিবাদ করি। একটা ভালো খবর জানতে পেরেছি, একেবারে নিষ্ঠুর হবেন না আমাদের গৃহস্বামী। আজকের এই বিরাট ধকল সামলাবার জন্য রাতে এক পুরনো রাজপ্রাসাদে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বন-জঙ্গল সাফ করতে, ঘরদোর পরিষ্কার করতে নতুন বিছানাপত্র নিয়ে সেখানে লোকজন এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে।
আর একবার মাত্র বাইরে গিয়েছিলাম। হ্যাজাকের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে। সমস্ত্ম গ্রাম জেগে রয়েছে। কোনও কথা শোনা যায় না। তবু একটা গমগমে আওয়াজ আসছে কানে। রান্নায় জায়গাটায় অনেক লোক। ছাগল দুটি অদৃশ্য আর সেই মানুষটি আমাদের সঙ্গে যিনি একটিও কথা বলেননি, এখনও

নয়, দুপুরে আমাদের দেখে যেন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্যালকটিকে পর্যন্তও অগ্রাহ্য করেছিলেন। দুপুরে এনে দিলেন করকরে ঠাণ্ডা ভাত-ডাল আর পুঁইশাক। যদি এই মানুষটির ভেতরে ঢুকতে পারা যেত!

ঘরে ফিরে এসে আমি তক্তপোশটার এক পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ি। রাত দুটোর দিকে আমাদের সবাইকে বাড়ির ভেতরে সবচেয়ে বড় ঘরটায় খেতে নিয়ে যাওয়া হল। আমার দু'চোখ জুড়ে ঘুম, খিদে-তৃষ্ণা পুরোপুরি উবে গেছে। নিদ্রার টানে টইটম্বুর শরীর দুমড়ে পড়ছে ঘরের মেঝেয়। তখন প্রচুর আলো, প্রচুর বাতাস, প্রচুর মানুষ সামনে ধরে দিচ্ছে নকশা করা চিনে মাটির বাসন, তাতে রাখছে ঘিয়ে জবজবে ধোঁয়া ওঠা পোলাও, রুই মাছ ভাজার এক একটি বিরাট টুকরো। পেস্লট ছাপিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ছে, মুরগির রান, মাছের কালিয়া, দোপেয়াজা, খাসির কোরমা মুখ-চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সত্যি বলতে কি জীবনে আর কখনও এত বিপুল খাদ্যবস্তুর দিকে এত ভাবলেশহীন নিস্পৃহ চোখে চেয়ে দেখিনি। বছর তিনেক পরে, একাত্তর সালের প্রথম দিকেই এপ্রিল-মে মাস হবে, খবর পেয়েছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল এক ঝাঁক বুলেটে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল ওঁর দেহ। সঙ্গে ছিল তার একমাত্র কিশোর পুত্র।